International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 230-237
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.286

ইষ্টকে উৎকীর্ন নামলেখ সমূহের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান

পিঙ্কি জানা

গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 08.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bricks are one of the primary archaeological artifacts that provide insight into the technological knowledge of people in ancient times. Archaeological excavations have uncovered the ruins of numerous brick-built structures, which undoubtedly indicate the presence of an urban civilization. Some of the bricks discovered from these ruins bear inscriptions, making them significant archaeological sources for reconstructing ancient Indian history.

In ancient India, the tradition of engraving inscriptions on bricks began during the post-Mauryan Śuṅga period and continued for a long time thereafter. Although many of these decorated bricks are relatively fragile and less durable, having remained exposed and unprotected in nature for long periods, their inscriptions are still legible today. The remarkable combination of technological knowledge and artistic skill displayed by ancient Indian craftsmen truly evokes a sense of wonder.

A comprehensive study of brick inscriptions found in India has not yet been completed, though the subject deserves further research. The topic has greatly intrigued me, which led me to pursue research in this area. In this paper, brick inscriptions found in India have been classified into several categories based on the diversity of their content – namely religious, donative, name-inscriptions, and miscellaneous (inscriptions engraved for various purposes).

Among these categories, the present study focuses on certain name-inscribed bricks discovered from archaeological sites such as Sahet-Mahet, Bhitari, Manjhi in Bihar, Guntupalli, Pawaya, and Kashipur in Nainital. However, discussing the inscriptions without reference to their archaeological context would be inappropriate. Therefore, it is essential to consider the nature of the archaeological sites in order to understand the true character and significance of these inscriptions.

Although the brick inscriptions found at the aforementioned sites primarily consist of names, they hold considerable importance for the study of ancient Indian history. The arguments and primary texts presented in this paper will be analyzed thoroughly, and a comparative discussion will be undertaken with other relevant archaeological and literary sources, giving priority to the most reliable evidence in the search for historical truth. The study also seeks to examine the extent to which brick inscriptions contribute to our understanding of the socio-economic, political, religious, and cultural history of ancient India.

Keywords: Brick inscriptions, name-inscriptions, Bhitari, Manjhi, Guntupalli, Kashipur, Sahet-Mahet

ভূমিকা:

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদানের অপ্রতুলতার ত্রুটি লক্ষণীয়। এই ঘাটতি পূরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (পুরাবস্তু, লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য)। আবার এই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে লেখমালার গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ সাহিত্যিক ও

অন্যান্য নানাবিধ তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি লেখ দ্বারা সমর্থিত হয়েই প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করে। তাই বলা যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার অন্যতম উপাদান হিসেবে লেখমালার অধ্যায়ন ব্যতীত ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ভারতে তাম্র, ব্রোঞ্জ, পিতল, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন ইত্যাদি ধাতু সহ টেরাকোটা সীল, মৃত্তিকা নির্মিত ফলক, ইষ্টক, মৃন্ময়-পাত্রাদি, কাষ্ঠদন্ড, পাটাতন, কাঁচ, হাতির দাঁত ও হার, কচ্ছপের খোল, প্রস্তরখন্ড, তোরণ, দ্বারদেশ, রেলিখ ক্যাসকেট ইত্যাদি উপাদানে লেখ খোদাই করা হত।[১] উক্ত লেখ খোদাইয়ে ব্যবহৃত সকল উপাদানের মধ্যে ইষ্টক হলো প্রাচীনকালের মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হওয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান। টি.এন.মিশ্রের মতে, প্রাচীন ভারতে মৌর্য পরবর্তী শুঙ্গ আমলে প্রবর্তিত ইষ্টক ফলকে লিপি উৎকীর্ণকরণের ঐতিহ্যের প্রবাহমানতা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল।[২] প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে ইষ্টক তথা ইষ্টক লেখ সম্পর্কিত গ্রন্থ বিরল এবং এ বিষয়ে কোনো পন্ডিত বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেননি। ইষ্টক লেখ গুলির বেশিরভাগই ভগ্ন প্রায় ও অস্পষ্ট হওয়ায় লেখতে উপস্থাপিত লিপি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। তাই এক্ষেত্রে গবেষণার অগ্রগতির লক্ষ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ ভিত্তিক তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সম্ভবত রৌদ্রে শুকনো করতে দেওয়া ইষ্টকে পশু-পাখির পায়ের ছাপ দেখে মানুষের মনে প্রথম ইষ্টকে লিপি উৎকীর্ণকরণের ভাবনা আসে। ইষ্টকে লিপি উৎকীর্ণকরনের ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। প্রথমত, স্ট্যাম্প বা ছাপ পদ্ধতি অর্থাৎ কোন অবয়বে ঋণাত্মক লিপি খোদাই করে সিক্ত ইষ্টকে ছাপ বা স্ট্যাম্প দিয়ে লিপি উৎকীর্ণকরণ। দ্বিতীয়ত, এনগ্রেভ বা খোদাই পদ্ধতি। তৃতীয়ত, স্ক্রাচ বা আঁচড় পদ্ধতি অর্থাৎ stilus জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে সিক্ত ইষ্টকে আঁচড় কেটে লিপি উৎকীর্ণকরণ।[৩] ভারতে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখগুলিকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যতা ভিত্তিতে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি যথা- ধর্মীয়, দানমূলক, নামলেখ, বিবিধ (নানাবিধ উদ্দেশ্যে উতকীর্ণ ইষ্টক লেখ)। উক্ত বিভাগগুলির মধ্যে নামলেখ ইষ্টক সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে। আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধে সাহেত-মাহেত, ভিটারি, বিহারের মানঝি, গুন্টুপল্লি, পাওয়ায়া, নৈনিতালের কাশিপুর প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখগুলির প্রাপ্তি স্থানের গুরুত্ব, লেখগুলি উৎকীর্ণকরণের প্রেক্ষাপট, লেখ জারিকর্তার পরিচয়, ইষ্টকে উপস্থাপিত বক্তব্য ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইতিহাস পুনর্গঠনে লেখগুলির অবদান কতটা ছিল তা অনুসন্ধান করেছি।

সহেত-মহেত ইষ্টক লেখ:

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম, বর্তমানে সহেত-মহেত নামে পরিচিত ২৮°৩১' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮২°১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ভারতের প্রাচীনতম সমৃদ্ধ নগরী শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন। উত্তপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ এর নিকটবর্তী দেবিপতন বিভাগের অন্তর্গত বলরামপুর থেকে ১৭ কিমি পশ্চিমে ও বহরৈচ থেকে ৩২ কিমি দূরে অবস্থিত সহেতকে তিনি জেতবন মহাবিহার নামে পরিচিত বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানসহ সন্নিকটস্থ স্থানের সাথে শনাক্ত করেন। এই বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি রাজা প্রসেনজিত এর পুত্র সুদত্ত এর পৃষ্ঠপোকষকতায় নির্মিত হয়েছিল। সহেত থেকে ৫০০ মিটার দূরে রাপ্তী নদী থেকে ১ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত মহেতকে তিনি সঠিকভাবে শ্রাবস্তী শহরের সাথে শনাক্ত করেছেন, এই নদীই রাপ্তী (প্রাচীন অছিরবতি) সহেত ও মহেতকে স্বতন্ত্র করেছে। তিনি নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জেতবন মহাবিহারটি ৪৭৫x১৫২ মি. স্থানজুড়ে বিস্তৃত। পরবর্তীকালে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় এই সহেটে অনুসন্ধান করে ১০ টি মন্দির, পাঁচটি স্তূপ ও কিছু মৃত্তিকা নির্মিত সীল, শপথমূলক স্তূপ, কিছু মূর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন, পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে হোয়ে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে

সহেতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছিলেন। পুনরায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সহেটের বিস্তৃত স্থানজুড়ে জে.পি.এইচ ভোগেল প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করে বিভিন্ন মূর্তিসহ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উৎকীর্ণ গোবিন্দচন্দ্র গাহড়ওয়ালের তাম্রশাসন আবিষ্কার করেছিলেন। এরপর ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে, স্যার জন মার্শাল ও দয়ারাম সাহানির তত্ত্বাবধানে পুনরায় সহেটে উৎখনিত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ প্রচুর স্তূপ, বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান, মঠ মন্দিরসহ লেখ, মুদ্রা, প্রচুর সংখ্যক ইষ্টক আবিস্কৃত হয়েছিল, এই ইষ্টকগুলির আয়তন ছিল আনুমানিক ১ ১/২"x৯ ১/২"x১ ২/৩" থেকে ১৮"x৯ ২/৪x২" ১/৯" মধ্যে।[৪] তৎসহ এখানে প্রাপ্ত ইষ্টকের ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি লেখ উৎকীর্ণ ভগ্নপ্রায় ইষ্টক আবিষ্কৃত হয়েছিল,[৫] এই লেখটিতে উপস্থাপিত বক্তব্য আলোচনার পূর্বে, এর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যিক।

ফা-হিয়েন এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনে এসে তার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন জেতবন মহাবিহারের উত্তর ও পূর্বদিকে দুটি প্রবেশ পথ ছিল। কানিংহাম এই উত্তরের প্রবেশ দ্বারকে ১ নং মন্দিরের পশ্চিমে এবং পূর্বের প্রবেশপথকে ২ নং মন্দিরের পূর্বে অবস্থিত বলেছিলেন। এই ২ নং মন্দিরের পূর্বদিক থেকে আলোচ্য ইষ্টক লেখটি দয়ারাম সাহানি ও জন মার্শাল আবিষ্কার করেছিলেন।[৬] তবে আশ্চর্যের বিষয় সমগ্র বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানটি ইষ্টক নির্মিত হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মাত্র একটি ভগ্নপ্রায় ইষ্টক লেখ আবিস্কৃত হয়েছে।

২ নং মন্দিরের পূর্বদিক থেকে আবিস্কৃত লেখ সম্বলিত ইষ্টক টুকরোটি মূল পাঠ 'Pavarikasya'[৭] এই 'পবরিকস্য' শব্দটি একজন ব্যক্তির নামকে সূচিত করে। তিনিই সম্ভবত এই ইষ্টক নির্মিত ২ নং মন্দিরটি দান করেছিলেন। তবে সম্পূর্ণ লেখটি আবিস্কৃত না হওয়ায়, উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। লেখটি কুষাণ আমলের ব্রাহ্মী লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, অর্থাৎ কুষাণ আমলে এই মন্দিরটি পরিকস্য নামে এক ব্যক্তিদান করেছিলেন। আলোচ্য লেখটির সাক্ষ্য দ্বারাই ২ নং মন্দিরটির সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে, কারণ আমরা জানি ইষ্টক নির্মাণকালেই ইষ্টক লেখ খোদাই করা হয় এবং কোনো স্থাপত্য নির্মানের সময়ই লেখ সম্বলিত ইষ্টকটি স্থাপত্যে স্থাপন করতে হয়। তাই বলা যায় প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে এই লেখটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ভিতারি ইষ্টক লেখ:

উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত সৈয়দপুর থেকে ৪ ১/২ মাইল উত্তর পূর্বে এবং বেনারস এর মধ্যবর্তীস্থানে গঙ্গাইনদীর বামতীরে অবস্থিত ভিটারীগ্রামে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম প্রথমবার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করার পর উৎখননে ভগ্নপ্রায় প্রস্তর ও ইষ্টক রাশি দ্বারা স্তূপীকৃত ঢিবিসহ কতকগুলি বৃহৎ ঢিবির মধ্যে, প্রান্তে অবস্থিত একটি বর্গাকার ঢিবির থেকে লোহিতবর্ণের বেলেপাথরের তৈরী ২ ফুট ৪ ১/২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত এবং ১৫ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি লেখযুক্ত স্তম্ভ বর্গাকার ভিত্তিমূলের ওপর স্থাপিত হয়েছিল, তৎসহ স্তম্ভটির পাদদেশে 'শ্রীকুমারগুপ্ত' কিংবদন্তী উৎকীর্ণ একটি পুরাতন ইষ্টক লেখ আবিস্কৃত হয়েছিল। বর্তমানে এই স্থানটি একটি মুসলিম কবরস্থানে পর্যবসিত হলেও, প্রাচীনকালে এটি একটি হিন্দু সংস্কৃতিসম্পন্ন মন্দির সংলগ্ন স্থান ছিল, কারণ এই স্থান থেকে বিভিন্ন ধরণের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি যেমন- দেবতা গণেশের বিশাল মূর্তিসহ ভগ্নপ্রায় নবগ্রহ মূর্তি ও প্রচুর লিঙ্গ পাওয়া গেছে। এছাড়া দুটি সাধারণভাবে দাঁড়ানোরত নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল, এগুলি সবই গুপ্ত পূর্ববর্তীযুগের বলে অনুমিত হয়। তবে এই স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রী কুমারগুপ্ত কিংবদন্তী খোদিত ইষ্টক লেখ আবিষ্কৃত হয়েছিল। আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম বলেছেন ভিটারিতে খনন কার্যের ফলে একটি পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবার এই স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্গাকার পুষ্প অলঙ্কৃত প্রস্তর এবং বিভিন্ন ধরণের ছাঁচ

আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবার ভিটারি গ্রামের চারিদিকে স্থিত বৃহৎ ঢিবিগুলির ওপরে বা সন্নিহিত স্থানে মন্দির বা কোনো দূর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন ক্যানিংহাম। এছাড়া গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিশ্চিতভাবে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থানের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তিনি। এই ভিটারীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রত্নবস্তুর মধ্যে বেশিরভাগ ভগ্নপ্রায় পুরাতন ইষ্টকের প্রাচুর্যতা লক্ষণীয়।[৮] এর থেকে অনুমিত হয়, এই অঞ্চলে উন্নত মানের ইষ্টক নির্মাণশালা বা ইটভাঁটা ছিল। আলোচ্য ইষ্টক লেখতে উৎকীর্ণ শ্রী কুমারগুপ্তের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত এবং শুধুমাত্র শ্রীকুমারগুপ্ত নামে এত পরিমাণ ইষ্টক লেখ খোদাই করার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে, পরবর্তীকালে এই স্থানটির প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রতিবেদনেউপস্থাপিত তথ্যাবলী সম্পর্কে আলোচনায় ব্রতী হলাম।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম কর্তৃক উৎখনিত স্থান, ভিটারীতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধান করা হয়েছিল, সম্পূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যধারা কে.কে.সিনহা মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। তাঁদের অনুসন্ধানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম কর্তৃক আবিষ্কৃত ভিটারী প্রস্তর স্তম্ভ লেখটির অজানা প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা।[৯] ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জেমস মিল স্তম্ভ লেখটি পাঠোদ্ধার করে মতপোষণ করেছিলেন স্কন্দগুপ্ত তাঁর রাজত্বকালের শেষপর্বে লেখটি জারি করেছিলেন অথবা তাঁর শিশুপুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখটি জারি করেছিলেন।[১০] লেখটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লেখটি খোদিত হয়েছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবে উৎখনিত স্থানে একটি বৈষ্ণব মন্দির ছিল। এছাড়া এই স্থানে পুনরায় খননকার্যের ফলে বহুসংখ্যক ইষ্টকের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে শ্রীকুমারগুপ্ত কিংবদন্তী উৎকীর্ণ ইষ্টক লেখ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এছাড়াও কিছু অলঙ্কৃত ইষ্টকও উদ্ধার করা হয়েছে, এইরকম শৈলীযুক্ত ইষ্টক ভিটারগাও মন্দিরে দৃষ্ট হয় এবং এই ধ্বংসাবশেষে ১-১২ মিটার প্রশস্থ ও ১৯-৯ মিটার দীর্ঘ একটি বিশাল ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রাচীরটির তুলনায় স্তম্ভ লেখটি প্রাচীন।[১১] এসকল প্রত্নসামগ্রী নিয়ে চর্চা হলেও 'শ্রীকুমারগুপ্ত' কে নিয়ে কোনো পন্ডিত আলোচনা করেননি বা তাঁকে কোনো রাজার সাথে শনাক্ত করেননি। যেহেতু এই লেখগুলি গুপ্তযুগের স্থাপত্যের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছিল তাই তাঁকে গুপ্তবংশের অন্তর্ভুক্ত করা অধিকযুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুদ্রাগত সাক্ষ্যে গুপ্তবংশে তিনজন কুমারগুপ্ত নামধারী শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এঁদের তিনজনের মুদ্রায় শ্রীকুমারগুপ্ত কিংবদন্তী উৎকীর্ণ রয়েছে। তাই আলোচ্য ইষ্টক লেখর শ্রীকুমারগুপ্তকে গুপ্তবংশের তিনজন কুমারগুপ্ত নামধারী রাজাদের মধ্যে সঠিকভাবে কার সাথে শনাক্ত করা যায় সে বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য ইষ্টক লেখর তবে সময়ানুক্রমের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে, প্রথম ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু তৃতীয় কুমারগুপ্ত তুলনামূলক পরবর্তীকালীন। যেহেতু স্কন্দগুপ্তের স্তম্ভলেখর সাথে একই স্তরে ইষ্টক লেখটি পাওয়া গেছে, তাই মনে করা হয় স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক শাসক এই ইষ্টক লেখগুলি উৎকীর্ণ করেছিল। তবে তিন কুমারগুপ্তের মধ্যে কোন রাজাকে আলোচ্য লেখর রাজা নির্বাচন করা অধিকযুক্ত সে বিষয়ে আলোকপাতে ব্রতী হলাম।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের (৪১৬-৪৫৬ খ্রীঃ) স্বর্ণ ও তাম্র নির্মিত ধনুর্ধর ধরণের মুদ্রায়, তরবারী ধরণের স্বর্ণমুদ্রায় ও সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ধরণের স্বর্ণমুদ্রায়, এছাড়াও পশ্চিমভারতের শকক্ষত্রপধরণের রৌপ্যমুদ্রায় 'শ্রী কুমারগুপ্ত' কিংবদন্তী উৎকীর্ণ রয়েছে।[১২]

তবে প্রথম কুমারগুপ্তের পরবর্তীকালীন দুজন কুমারগুপ্ত নামধারী গুপ্তশাসককে নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, মুদ্রাগত ও লেখগত সাক্ষ্য দ্বারা সেই সংশয় দূর করার চেষ্টা করছি। ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সারনাথ বৌদ্ধমূর্তি লেখতে পিতৃপরিচয়হীন কুমারগুপ্তের কথা জানা যায়, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত নন, কারণ প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। আবার ভিটারী ও নালন্দা সীলে এবং বিষ্ণুগুপ্তের নালন্দা সীলে নরসিংহগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ছিলেন কুমারগুপ্ত। কিছু ধনুর্ধর ধরণের কুমারগুপ্ত কিংবদন্তী উৎকীর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে তাঁকে প্রথম কুমারগুপ্ত হিসাবে শনাক্ত করা যায় না, যিনি পরবর্তীকালে মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (মুদ্রাগত সাক্ষ্য অনুসারে)। তাই উপরিউল্লিখিত লেখগত ও বর্তমান মুদ্রাগত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, গুপ্তবংশে এই কুমারগুপ্ত নামে একাধিক রাজা ছিল।[১৩] ধনুর্ধর ধরণের এই মুদ্রাকে কিছু পার্থক্যের ভিত্তিতে আলতেকার মহাশয় দুটি শ্রেনীতে ভাগ করেছেন। এই দুটি শ্রেনীরই মুদ্রার মুখ্যদিকে মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত কিংবদন্তী উৎকীর্ণ আবার প্রথম শ্রেনীর মুদ্রার গৌণদিকে ক্রমাদিত্য এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর মুদ্রার গৌণদিকে শ্রীক্রমাদিত্য কিংবদন্তী উৎকীর্ণ রয়েছে।[১৪] আবার প্রথম শ্রেনীর মুদ্রায় ৭০-৮০ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণ রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেনীর মুদ্রায় মাত্র ৫৪ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণ রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেনীর মুদ্রায় মাত্র ৫৪ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণ রয়েছে। আবার দ্বিতীয় শ্রেনীর মুদ্রায় মুখ্যদিকে রু, উ, গ্রে, গো, জা, ভা ইত্যাদি বর্ণগুলি এককভাবে উৎকীর্ণ করা হলেও, এই বর্ণের মধ্যে আবার কোনোটাই আবার প্রথম শ্রেনীর মুদ্রায় দৃষ্ট হয় না। এছাড়াও দুটি মুদ্রার নির্মাণ শৈলীতে, ও তৌলমানে পার্থক্য দৃশ্যমান। এসব কিছু বিবেচনা করে এ.এস.আলতেকার মতপ্রদান করেছেন প্রথম শ্রেনীর মুদ্রার জারিকর্তা সার্বভৌম শাসক ছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেনীর মুদ্রার জারিকর্তা বুধগুপ্তের অধস্তন সামন্ত তৃতীয় কুমারগুপ্ত ছিলেন। সুতরাং প্রথম শ্রেনীর মুদ্রার রাজা কুমারগুপ্তকে সারনাথ লেখর রাজা কুমারগুপ্তের সাথে শনাক্ত করা যায় দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত হিসাবে অধিক পরিচিত। আবার তৃতীয় কুমারগুপ্ত ছিল নরসিংহ গুপ্তের পুত্র ও ভিটারী সীলের জারিকর্তা, তাঁর শাসনকাল সূচিত হয় সম্ভবত ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তের পুত্র ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকাল ৪৭৩-৪৫৭ খ্রীঃ ছিল। অনেক পন্ডিত তৃতীয় কুমারগুপ্তকে আবার যশোধর্মনের সাথে সংযুক্ত করেছেন।[১৫]

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এই তিনজন রাজাই, শ্রীকুমারগুপ্তের লেখটি জারিকর্তা হওয়ার সমান দাবি রাখে। তবে যেহেতু ইষ্টক লেখটি স্কন্দগুপ্তের ভিটারী স্তম্ভলেখর সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছিল তাই মনে করা হয়, স্কন্দগুপ্তের পূর্ববর্তী বা অব্যবহিত পরবর্তী কুমারগুপ্তই ইষ্টক লেখটির জারিকর্তা। প্রথম কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের ঠিক পূর্ববর্তী ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের ঠিক পরবর্তী শাসক ছিলেন এবং তৃতীয় কুমারগুপ্ত বহু পরবর্তীকালীন শাসক ছিলেন,[৬৯]তাই তাঁর সম্ভাবনা কম। আবার ভিটারিতে তৃতীয় কুমারগুপ্তের তাম্র নির্মিত সীল আবিষ্কৃত হয়েছে তাই ভিটারিতে তাঁর নাম উৎকীর্ণ ইষ্টক লেখ পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম কুমারগুপ্তের কোনো লেখ ভিটারী থেকে আবিষ্কৃত হয়নি তাই, তাঁকে নিয়ে সংশয় রয়েছে। দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত হতে পারে কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননকর্তা মতপ্রদান করেছেন স্কন্দগুপ্তের প্রস্তর স্তম্ভ লেখটি ইষ্টকগুলির তুলনায় প্রাচীন। তাই দ্বিতীয় শ্রীকুমারগুপ্তকে ভিটারীতে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখর কুমারগুপ্ত বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে অধিক তথ্যপ্রমাণের প্রয়োজন।

তবে বহুসংখ্যক 'কুমারগুপ্ত' কিংবদন্তী উৎকীর্ণ ইষ্টক লেখ আবিষ্কৃত হওয়ার কারণ সম্পর্কে অনুমিত হয়, প্রাচীনভারতে ভিটারী গ্রামে ইষ্টক নির্মাণশালা ছিল, অথবা হতে পারে ইষ্টক লেখ খোদাই করার সময়ে শ্রীকুমারগুপ্তের কিংবদন্তী উৎকীর্ণ লেখগুলিতে কিছু ভ্রান্তি ঘটেছিল তাই বাতিল করা হয়েছিল। আবার তৎকালীন সময়ে রাজত্বকারী রাজা কুমারগুপ্ত (কোন কুমারগুপ্ত তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না) রাজকীয় সীল

উৎকীর্ণকরণের উদ্দেশ্যেলেখ শুধুমাত্র শ্রীকুমারগুপ্ত কিংবদন্তী খোদাই করান। আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম বলেছিলেন সেই সময় ভিটারীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য ছিল, হতে পারে প্রথম কুমারগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মৃতিরক্ষার্থে বা সকলের জ্ঞাতার্থে যজ্ঞবেদীর প্রতিটি ইষ্টকে 'শ্রীকুমারগুপ্ত' কিংবদন্তী উৎকীর্ণ করান। আবার এও হতে পারে, প্রতিপত্তিশীল গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো মন্দির বা স্থাপত্য নির্মাণের সময় স্বীয় নামে খোদিত ইষ্টক দিয়ে নির্মাণ করেন, সকলকে তাঁর দান সম্পর্কে জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। তবে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে আলোচ্য লেখর এই 'কুমারগুপ্ত' নিশ্চিতভাবে গুপ্তবংশের রাজা ছিলেন। তবে কুমারগুপ্তের নাম উৎকীর্ণ এই ইষ্টক লেখগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যায়, তিনি একটি ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুপল্লিতে প্রাপ্ত একটি ইষ্টক লেখঃ অন্ধ্রপ্রদেশের অর্ন্তগত পশ্চিম গোদাবরী জেলাতে অবস্থিত কামাবারপুকোটা থেকে ৬ মাইল দূরে একটি ছোট্ট গ্রাম গুন্টুপল্লিতে ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে এ. এইচ. লঙহাস্ট এর তত্ত্বাবধানে উৎখননের ফলে একশিলা স্তূপ, প্রস্তর দ্বারা নির্মিত বিহার, একটি ইষ্টক নির্মিত চৈত্য, প্রচুর শপথমূলক স্তূপের ধ্বংসাবশেষ সহ একটি ইষ্টক নির্মিত স্তূপের ভগ্নাংশের একটি সিঁড়িতে ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ন ইষ্টক লেখ আবিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ লেখটির মূলপাঠ—"sanadata"।[১৬] লেখটির পাঠোদ্ধার কর্তা হলেন কৃষ্ণা শাস্ত্রী। লেখটির নিহিতার্থ সম্ববত একজন বৌদ্ধনারী শিষ্যা সন্ন্যাসী সুয়জ্জনাথ এর আদেশ মান্য করে চলবে। গুন্টুপল্লি উৎখননে প্রাপ্ত একমাত্র লেখগত উপাদান হিসাবে ইষ্টক লেখটির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একটি ধর্মীয় লেখ।

মধ্যপ্রদেশের পাওয়ায়াতে প্রাপ্ত একটি ইষ্টক লেখ:

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলার অর্ন্তগত সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম পাওয়ায়া। এইচ. এইচ. উইলসন প্রথম বলেছেন এই পাওয়ায়া প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের সমৃদ্ধশালী নগর পদ্মাবতী। বিষ্ণুপুরান অনুসারে, ওইসময়ে পদ্মাবতীতে নাগবংশীয় রাজারা রাজত্ব করত। এই পদ্মাবতীতে স্থিত একটি বৃহৎ ঢিবি উৎখননের ফলে একটি পিরামিড আকৃতির ইষ্টক নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ ও একটি ইষ্টক নির্মিত বিষ্ণু মন্দির আবিষ্কৃত হয়, যদিও মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে একটি লেখ সম্বলিত মূর্তি (মনিভদ্র), একটি মূর্তিলেখ সহ ব্রাহ্মী লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ লেখ সম্বলিত ইষ্টক আবিষ্কৃত হয়। লেখটির মুলপাঠ—"(Go)vinda(deva).[১৭] সম্ভবত গোবিন্দদেব একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যিনি মন্দিরের কোন বিশেষ কিছু দান করার নজির হিসাবে নিজ নাম উতকীর্ন করান। প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করে মনে করা হয় যে এই মন্দিরে দেবতা বিষ্ণুর উপাসনা করা হত। যেহেতু স্থানটি থেকে খুব কমই লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই স্থানটির প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে ও ইতিহাস অনুসন্ধানে উক্ত ইষ্টক লেখমালাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বিহারের মানঝিতে প্রাপ্ত একটি ইষ্টক লেখঃ বিহারের অর্ন্তগত গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত চ্চাপ্রার ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মানঝি গ্রামটিতে প্রথম অনুসন্ধান করে এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুভব করেন ডঃ হোয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ড. স্পুনের স্থানটি পরিভ্রমনে যান এবং একটি প্রাচীন দূর্গের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য। বর্তমানে এটি একটি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত পরিখা দ্বারা আবৃত উপবৃত্তাকার ঢিবি এবং স্থানটিতে একটি মধ্যযুগীয় মাধবেশ্বর মন্দির রয়েছে। উক্ত ঢিবি থেকে বুদ্ধের ভূমি-স্পর্শ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, এছাড়াও ঢিবি থেকে স্পুনের খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপি ও সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ একটি ইষ্টক লেখ আবিষ্কার করেন। লেখটির মূলপাঠ--"sri prathamaditya"।[১৮] তিনি বলেছেন শ্রী প্রথমাদিত্য গুপ্ত বংশীয় একজন অপরিচিত রাজা ছিলেন। এটি একটি রাজকীয় লেখ।

নৈনিতালের কাশিপুরে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখ:

কাশিপুর বর্তমান উত্তরাখন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তরাই অঞ্চলে উধম সিং নগর জেলায় অবস্থিত। অতীতে এটি নৈনিতাল জেলার অংশ ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে কাশিপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাচীনকালে এই স্থানটি 'গোবিষান' নামে পরিচিত ছিল। Xuan-Zang এর বর্ননা অনুসারে, গোবিষন অঞ্চলটিতে প্রচুর বৌদ্ধমঠ ও অশোক নির্মিত স্তূপ রয়েছে। এই কাশিপুর সংলগ্ন স্থান থেকে দুটি লেখ উতকীর্ন ইষ্টক আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি লেখর মূলপাঠ- 'Pritvi-mitra' এবং অপর লেখর মূলপাঠ- 'matra-mitta-putta.'[১৯] লেখ দুটির লিপি ব্রাহ্মী। লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায় এটি খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে উতকীর্ন করা হয়েছে। মাত্র মিত্রের পুত্র পৃত্বি মিত্র শুধুমাত্র এই তথ্যটিই উপস্থাপিত হয়েছে। এই লেখটি এমন একটি বংশপরম্পরার নির্দেশ করে যেখানে উত্তরাধিকার বা বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকীয় উপাধি বা নাম ব্যবহার করা হত। যা প্রাচীন ভারতীয় লেখমালার একটি সাধারন বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রিয় কুষান শক্তির পতনের পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে (যেমন- পাঞ্চাল বা মথুরা) যে স্থানীয় রাজবংশগুলো শাসন করত, এই মিত্র রাজারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার:

সামগ্রিক আলোচনার পর বলা যায় উপরিউক্ত নামলেখগুলি কোনো না কোনো ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্যের অংশ। এই লেখগুলি স্থাপত্যটির প্রাচীনত্ব নির্নয়ে সাহায্য করেছে। কাশিপুর ইষ্টক লেখ থেকে মিত্র বংশীয় রাজা পৃত্বি মিত্রের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়, যা ইতিপূর্বে অন্যকোনো উপাদান থেকে জানা যায়নি। ভিতারি ইষ্টক লেখ থেকে গুপ্তবংশীয় রাজা শ্রী কুমার গুপ্তের নাম পাওয়া গেছে তবে তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাসত্ত্বেও তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি ও রাজ্যকাল সম্পর্কে জানা যায়। মানঝি ইষ্টক লেখ গুপ্ত বংশীয় এক অপরিচিত রাজা শ্রী প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস পাদপ্রদীপের সামনে এনে আলোকময় করে তোলে। সাহেত মাহেতে ও পাওয়ায়াতে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখ দ্বারা প্রমানিত হয় তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধবিহারে ও হিন্দু মন্দিরে পৃষ্ঠপোষকতা দানের রীতি ছিল তা বহুদিন প্রচলিত ছিল। হয়ত গোবিন্দদেব ও পবরিকস্য কোনো ব্যাবসায়ী ছিলেন, তারা ব্যাবসায়িক সূত্রে সেখানে যেতেন বা রাত্রিযাপন করতেন তাই দান করেছেন। এরকম দানের নজির বৌদ্ধমঠ গুলিতে প্রায়ই দেখা যেত। গুন্টুপল্লিতে প্রাপ্ত ইষ্টক লেখ থেকে জানা যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীনিকে মঠের নিয়মকানুন মেনে চলতে হত এবং তাঁর গুরুর আদেশ মান্য করতে হত। আলোচ্য ইষ্টক লেখগুলির আলোকে প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য-রাজনীতি, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোকময় হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১। Richard. Salomon, Indian Epigraphy, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 1996, P: 126-130.

২। T.N. Mishra, Ancient Indian Bricks and Brick Remains, Harman Publishing house, New Delhi, 1997, P.24.

৩। N.P. Chakravarti, "Two Brick inscription from Nalanda" Epigraphia IndicaVol- XXI, New Delhi, 1931-32, P. 193-195.

৪। Marshall, John., Vogel, J.Ph, Archaeological Survey of India Annual Report, 1910-11, P.22-24.

৫। Chakraborty, Dilip.K., History of Ancient India III (The text, Political Historyand administration till (200 BC), Aryan Book International, 2014, P.629-633.

৬। ibid., P.7.

৭। ibid., P.21.

৮। Cunninghum. A., Archaeological Survey of India Annual Report Vol-I,1861-62, PP-96-103.

৯। Lal, B.B., Indian Archaeology Review, 1968-69, New Delhi, P-33.

১০। Cunninghum, A., op.cit, P-99.

১১। Lal.B.B, op.cit., PP- 33-34.

১২। Altekar, A.S., The Coinage of Gupta, Numismatic Society of India, Banaras Hindu University, 1957, PP-170-173, 185, 213, 220, 225.

১৩। Srivastava, Prashant**,** Encyclopedia of Indian coins (Ancient Coins of NorthernIndia upto circa 650 AD), A GamkalaPrakashan, 2012, PP- 273-275.

১৪। Altekar, A.S. op,cit., 273-275.

১৫। Srivastava, Prashant., op.cit, P. 219-221.

১৬। Subramanyam. R, "An early Brahmi Inscription from Guntupalli", Proceeding of the Indian History Congress, vol-28, Indian History Congress, 1960, PP-114-121.

১৭। Michael.D. Willis, "Inscriptions of Gopaksetra: Materials for the History of Central India", British Museum Press, The University of Michigan, 1996, P-118.

১৮। Patil, Devendra, The Antiquarian remains in Bihar, vol- IV, Kashi Prasad Jayaswal research Institute Patna, 1963, PP- 269-270.

১৯। Journal of Indian History Congress vol- XXXVI, The University of Kerala Trivandrum, 1959, PP- 59-61.